দৈনিক জনকণ্ঠ

JUN. 29 2002

উপরসা সমাধান নয়

সেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কার্যত একই কথা বলা হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে প্রকৃতপক্ষে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করারই পায়তারা কষা হচ্ছে। ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছে মাথা কেটে মাথা ব্যথা দূর করার মতোই! গত বছরের শেষদিকে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া শিক্ষাঙ্গনে হানাহানি ও অরাজকতা চলতে থাকলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া হবে বলে জাতীয় সংসদে যে বক্তব্য দেন তার বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদের বৈঠকে নিন্দা প্রস্তাব আনা হয়। ছাত্রদল ছাড়া ক্যাম্পাসে সক্রিয় সব সংগঠন সে প্রস্তাব সমর্থন করে। সে সময় ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা না করা নিয়ে বিএনপিতে মতবিরোধের তথ্যও প্রকাশ পায়।

এখন আবার দেখা যাচ্ছে, জোট সরকারের গঠিত শিক্ষা বিশেষজ্ঞ জাতীয় কমিটি শিক্ষকদের রাজনীতি করা বেআইনী ঘোষণা ও শিক্ষাঙ্গন রাজনীতিমুক্ত রাখার সুপারিশ করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের কথা বলে গঠিত ৪৬ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটি শিক্ষাসংক্রান্ত প্রায় দু'শ' সুপারিশ প্রণয়ন করেছে এবং অবিলম্বে সেগুলো চূড়ান্ত করার জন্য সরকারের কাছে পেশ করবে। এসব সুপারিশে প্রকৃত সমস্যা ধামাচাপা দিয়ে রেখে সেসব সমস্যার প্রকাশ কৃত্রিমভাবে রোধ করার অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক ও হাতুড়ে ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়েছে বলেই গণতন্ত্রমনা দেশবাসী ও পর্যবেক্ষক মহলের অভিমত।

সেই পরাধীন ও পাকিস্তানী আমল থেকে সমাজের শিক্ষিত ও সচেতন অংশ ছাত্র-শিক্ষকরা নানাভাবেই ঔপনিবেশিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনশোষণের বিরুদ্ধে দুর্বার সংগ্রাম চালানো এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আত্মদানের সুমহান ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। আজ শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করার নামে তাদের সে গৌরবময় ঐতিহ্যকে খাটো করে দেখা বা খর্ব করার চেষ্টা করা হলে তা হবে দুর্ভাগ্যজনক। এটা অবশ্যই দেশবাসীর কাম্য নয় যে, আমাদের সম্মানীয় শিক্ষকরা, ছাত্ররা দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি করে হানাহানি, দলাদলি করে আন্দোলন বা নির্বাচনের নামে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে ফেলবেন। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে ক্যাম্পাসে প্রকৃতপক্ষে কারা, কাদের নেপথ্য মদদে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধিয়ে, সাধারণ নিরীহ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণের পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে, এমনকি অকালে অমূল্য প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে, তা তো কারও অজানা নয়। শিক্ষা প্রশাসনকে যে সরকার ঠিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হচ্ছে, নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছাত্র সংগঠনের মধ্যে বা শিক্ষক নেতৃত্বের কোটারী সৃষ্টি করছে, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজিকে প্রকারান্তরে উৎসাহিতই করা হচ্ছে, ছাত্র নামধারী সশস্ত্র বহিরাগতদের শিক্ষাঙ্গন ও ছাত্রাবাসে অবস্থান ও অপতৎপরতা বন্ধে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হচ্ছে, সুপারিশ প্রণয়নকালে বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ কমিটি সেদিকে কি ঠিকভাবে দৃষ্টি দিতে পেরেছে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন অবস্থাতে যাতে ধর্মঘট ডাকা না হয় এবং শিক্ষা ভবন বা প্রশাসনিক ভবনে যাতে কেউ তালা দিতে না পারে বা ঘেরাও করে কাউকে জিম্মি করতে না পারে, কমিটি সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে। বলা হয়েছে, ছাত্র সংগঠনগুলো কোন অবস্থাতেই রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হতে পারবে না। এমনকি কোন রাজনৈতিক ইস্যুতে ক্যাম্পাসে পিকেটিং-মিছিল-সমাবেশ করা যাবেনা, উস্কানিমূলক স্লোগান দেয়া যাবে না। শুধু শিক্ষা সংক্রান্ত দাবিদাওয়া স্মারকলিপি আকারে পেশ করা যাবে। আপাতদৃষ্টিতে এগুলোর মধ্যে নিরীহ ও সাধু সুপারিশ থাকলেও বেশিরভাগের মধ্যেই আছে নিছক উপরসা কিছু সমাধান। এ ধরনের সুপারিশে তেমন কোন কাজ হবে না। ক্যাম্পাস ও শিক্ষাঙ্গনকে শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতিমুক্ত নয়, বস্তুত দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসীমুক্ত, মাদকাসক্তিমুক্ত, অস্ত্র ও সহিংসতামুক্ত, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারমুক্ত করতে হবে। সেজন্য সমস্যার অনেক গভীর ও মূলেই যাওয়া অপরিহার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব ক্যাম্পাস-পুলিশ গঠনে যাতে নতুন সমস্যা সৃষ্টি না হয়, তাও দেখা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের '৭৩-এর অধ্যাদেশ অগণতান্ত্রিকভাবে সংশোধনে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে এবং উপাচার্য, সিনেট, সিন্ডিকেটের নির্বাচন-প্রক্রিয়ার প্রকৃত গণতন্ত্রায়নেই মাত্র সমস্যার সমাধান হতে পারে, অন্য কোনভাবে নয়। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগবিধিরও এমন প্রয়োজনীয় সংশোধনীই কাম্য, যাতে এই বেকারের দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি না-পায়, সেইসঙ্গে প্রাথমিক স্তরে দায়িত্বশীল ও সুশিক্ষকও নিয়োগ করা যায়। স্কুল-কলেজের জন্য শিক্ষা সার্ভিস কমিশন গঠন বা সরকারী শিক্ষকদের মতো বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য চাকরিবিধি প্রণয়নও যাতে শিক্ষকদের প্রতি অবিচার-বৈষম্য দূর করতে ও মর্যাদাবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়, সেটাই বিবেচ্য হওয়া উচিত। কমিটি-প্রণীত সুপারিশগুলোর একটি বা দু'টি নয়, সব ক'টির ব্যাপারেই প্রকৃত অর্থে জাতীয় ঐকমত্য দরকার। সংসদে তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শিক্ষাঙ্গন, ছাত্র ও শিক্ষকদের ওপর অগণতান্ত্রিক বিধিবিধান চাপিয়ে বুনিজির সৃষ্টি করা হলে দেশের জন্য তা কিছুতেই মঙ্গল বয়ে আনতে পারেনা।